নেতাজির ছয় মূর্তি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

নেতাজির ছয় মূর্তি

[নেতাজির ছয় মূর্তি গ্রন্থটি মমতাজ বেগমের কালো মুক্তো নামেও প্রকাশিত হয়েছে।]

।। এক ।। অসাধারণ পাগলামি

চায়ের পালা শেষ।

জয়ন্ত বললে, মানিক অতঃপর কিংকর্তব্য। এক চাল দাবাবোড়ে খেলবে নাকি?

—রাজি! মানিক উঠে দাবাবোড়ের ছক আনতে গেল।

–সুন্দরবাবু কী করবেন? খেলা দেখবেন, না থানায় ফিরবেন?

—ওই ইজিচেয়ারে আরাম করে পা ছাড়িয়ে শুয়ে আমি একটা গোটা চুরুটকে ভষ্মে পরিণত করব।

-হাতে বুঝি নতুন মামলা নেই?

—বিশেষ কিছু নাই।

—তবু শুনি না। খুঁটি সাজাতে সাজাতে বললে জয়ন্ত।

—এ একটা নিতান্ত বাজে মামলা ভাই, ল্যাজা কি মুড়ো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। এ মামলায় গোয়েন্দা না ডেকে ডাক্তার ডাকাই উচিত।

—অর্থাৎ?

—পাগলামি আর কী? কিন্তু অদ্ভুত রকম পাগলামি। সুভাষচন্দ্র বসুকে সারা দেশ ভক্তি করে তো? কিন্তু দেশে এমন লোকও আছে, যে নেতাজির প্রতিমূর্তি দেখলেই খেপে গিয়ে আছড়ে চুরমার করে দেয়।

—ধেৎ, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত একটা বোড়ের চাল দিলে।

—হ্যাঁ, পাগলামি সারাবার জন্যে ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু কেউ যদি নেতাজির উপরে নিজের আক্রোশ মেটাবার জন্যে পরের বাড়িতে ঢুকে নেতাজির প্রতিমূর্তি চুরি করে, তাহলে পুলিশ না ডেকে উপায় থাকে না।

জয়ন্ত খেলা ভুলে সিধে হয়ে বসে বললে, মূর্তি ভাঙবার জন্যে মূর্তি চুরি? ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে! বলুন তো খুলে!

—চিৎপুর রোডে শিল্পশালা বলে এক দোকান আছে, তার মালিক হচ্ছেন অনিল বসু। ওখানে বিক্রি হয় নানারকম ছবি আর মূর্তি। দোকানের এক কর্মচারী সামনের দিক ছেড়ে পেছন দিকে গিয়ে কোনও কাজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ একটা লোক দোকানে ঢুকে কাউন্টারের উপর থেকে নেতাজির প্রতিমূর্তি তুলে নিয়ে মাটির উপরে আছড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর এত তাড়াতাড়ি সে পালিয়ে যায় যে কেউ তাকে ধরতে পারেনি। এ হচ্ছে চার দিন আগেকার কথা। দোকানের মালিক বিটের পাহারাওয়ালার কাছে অভিযোগ করেছিল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত! প্লাস্টারে গড়া মূর্তি, দাম দশ টাকা মাত্র তুচ্ছ ব্যাপার!

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা। এটা কিঞ্চিৎ গুরুতর, অদ্ভুত বটে। ঘটেছে কাল রাত্রে।

ডাক্তার চক্রবর্তীর নাম শুনেছ তো? তাঁর বাসভবন হচ্ছে সিমলায়, আর ডাক্তারখানা কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। তিনি নেতাজির গোঁড়া ভক্ত। ওই শিল্পকলা থেকেই তিনি নেতাজির দুটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলেন। তার একটিকে রেখেছিলেন বসত বাড়িতে আর একটিকে ডাক্তার খানায়। কাল রাত্রে বাড়িতে চোর ঢুকেছিল; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে নেতাজির

মূর্তি ছাড়া আর কিছুই চুরি করেনি। বাড়ির বাইরেকার বাগানে গিয়ে মূর্তিটা দেওয়ালে আছড়ে ভেঙে সে লম্বা দিয়েছে।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, আজব কাণ্ড। তিনটে মূর্তিই কি এক ছাঁচ থেকে গড়া?

-হ্যাঁ তারপর শশানো। আজ সকালে চারুবাবু ডাক্তারখানায় ঢুকে দেখেন, সেখানেও কাল রাত্রে কে এসে নেতাজির মূর্তি নিয়ে ভেঙেছে আর মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে তার ভাঙা টুকরোগুলো! এই তো ব্যাপার, জয়ন্ত! এ কীরকম মামলা ভায়া?

—কেবল অদ্ভুত নয়, সৃষ্টিছাড়া বলাও চলে। কিন্তু লোকটা যদি পাগল হয়, তাহলে তার পাগলামির ভিতর বেশ একটি পদ্ধতি আছে দেখছি।

—পদ্ধতি?

—হ্যাঁ! চারুবাবুর বাড়ি থেকে মূর্তিটা সে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল পাছে মূর্তি ভাঙার শব্দে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায় এই ভয়ে! ডাক্তারখানায় অন্য লোকের ভয় নেই, তাই মূর্তিটা ভাঙা হয়েছে ঘরের ভিতরেই। ঘটনাগুলো আপাতত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হচ্ছে। বটে, কিন্তু জানেন তো সুন্দরবাবু গোয়েন্দার কাছে অকিঞ্চিৎকর নয় কিছুই। আমি একবার ঘটনাস্থলে একগাছা ভাঙা লাঠি পেয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করেছিলুম। যাক সে কথা। এই পাগল আবার যদি কোনও কাণ্ড করে আমাকে জানাবেন। এখন আপনি খান চুরুট, আমরা খেলি দাবা-বোড়ে।

।।দুই ।। হারাধনবাবুর দগ্ধাদৃষ্ট

নতুন ঘটনা ঘটতে দেরি লাগল না।

পরদিন প্রভাত। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শুনে রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত শুনলে সুন্দরবাবু বলেছেন: শিগগির এসো। পনেরো নম্বর পঞ্চানন পাল স্ট্রিটে।

রিসিভারটা যথাস্থানে স্থাপন করে মানিকের দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, চটপট চুমুক দিয়ে চা শেষ করো। সুন্দরবাবুর আমন্ত্রণ এসেছে।

—ব্যাপারটি কী?

—ঠিক বোঝা গেল না। খুব সম্ভব সেই মূর্তি ধ্বংসকারী উন্মত্তের নতুন কীর্তি।

পঞ্চানন পাল স্ট্রিটের পনেরো নম্বর হচ্ছে একখানা সাধারণ বাড়ি, দরজার সামনে রাস্তার উপরে কৌতূহলী জনতা।

জয়ন্ত বললে, এত ভিড় কেন? নিশ্চয় যা তা ব্যাপার নয়। এই যে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরবাবুর। কী মশাই খবর কী?

সুন্দরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন বাড়ির ভিতরে এসো।

বৈঠকখানায় বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তার ভাবভঙ্গি অত্যন্ত উত্তেজিত।

সুন্দরবাবু বললেন, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত রিপোর্টার হারাধনবাবু। তোমাদের পরিচয় আর দিতে হবে না, ইনি তোমাদের চেনেন।

–জরুরি তলব করেছেন কেন?

—হুম, আবার সেই নেতাজির মূর্তির মামলা।

—আবার নতুন কোনও মূর্তিভঙ্গ হয়েছে?

—আবার মূর্তিভঙ্গের উপর হত্যাকাণ্ড! হারাধনবাবু ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।

বিরসবদনে হারাধনবাবু বললেন, এ যেন প্রকৃতির নির্দয় পরিহাস। পরের খবর সংগ্রহ করতে করতে সারাজীবন কাটিয়ে দিলুম, আর আমার নিজের বাড়ির এত বড়ো খবরটা

নিয়ে কাগজে পাঠাতে পারছি না, আমার মাথা এমন ভয়ানক গুলিয়ে গিয়েছে। বাইরের রিপোর্টারের মতন আমি যদি এখানে আসতুম, প্রত্যেক কাগজের জন্য অন্তত দু-কলম করে খবর পাঠাতে পারতুম। তা তো হলই না, উলটে এর ওর তার কাছে বারবার বলে খবর ক্রমেই বাসি করে ফেলছি। তবে আপনার কথা আলাদা জয়ন্তবাবু। আপনি যদি সব শুনে এই অদ্ভুত রহস্যের কোনও হদিস দিতে পারেন তবে আমার মস্ত লাভ হতে পারে।

জয়ন্ত চুপ করে শুনলে, কিছু বললে না।

হারাধনবাবু বললেন, মাস চারেক আগে শ্যামবাজারের লক্ষীর ভাণ্ডার থেকে আমি নেতাজির একটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলাম। মনে হচ্ছে সেই মূর্তির জন্যেই এই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। বাড়ির সব উপরকার ঘরে বসে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয়, কালও করছিলুম।

গভীর রাতে বাড়ির একতলায় একটা যেন শব্দ হল। খানিকক্ষণ কান পেতে রইলুম, কিন্তু আর কিছু শুনতে না পেয়ে ভাবলুম, শব্দটা এসেছে বাড়ির বাহিরে থেকেই। মিনিটপাঁচেক কাটল। তারপর বিষম এক আর্তনাদ। জয়ন্তবাবু অমন ভয়াবহ আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। তার স্মৃতি জীবনে আর কোনওদিন ভুলতে পারব না, ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে দু-এক মিনিট চুপ করে বসে রইলুম তারপর একগাছা লাঠি নিয়ে নীচে নেমে এলুম। বৈঠকখানায়—অর্থাৎ এই ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিলের উপর থেকে, অদৃশ্য হয়েছে। নেতাজির প্রতিমূর্তিটা! সব ফেলে এই কম দামি জিনিসটা নিয়ে গিয়ে চোরের কী লাভ হবে, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

এমন সময় নজর পড়ল, বৈঠকখানা থেকে রাস্তার দিকে যাবার দরজাটা রয়েছে খোলা। এই পথ দিয়েই চোর পালিয়েছে বুঝে আমিও অগ্রসর হলুম। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, হঠাৎ একটা দেহের উপর ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলুম কোনও গতিকে। দেহটার অস্বাভাবিক স্পর্শ পেয়েই বুঝলুম, সে হচ্ছে মৃতদেহ।

দৌড়ে বাড়িতে এসে একটা লণ্ঠন নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি যেন রক্ত-নদীর ভিতর ভাসছে। একটা মানুষের মৃতদেহ, গলার উপরে তার প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। চিত হয়ে সে পড়ে আছে, হাঁটুদুটো গুটানো, মুখটা বিশ্রী ভাবে হাঁ করা! মশাই, এবার থেকে রোজ সে বোধ হয় স্বপ্নে আমাকে দেখা দেবে। পুলিশ, পুলিশ! বলে বারকয়েক চিৎকার করে আমি তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলুম। তারপর কী হয়েছিল জানি না, কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান আসায় দেখলুম আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এক পাহারাওয়ালা।

সব শুনে জয়ন্ত বললে, কিন্তু মৃতদেহটা কার?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। লাশটা শবাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে গেলেই দেখতে পাবে। এখন পর্যন্ত আমরা কিছুই ঠিক করতে পারিনি। লোকটা বেশ ঢ্যাঙা-ঢঙা, গায়ের রং রোদে-পোড়া, দেখতে রীতিমতো জোয়ান, বয়স ত্রিশের বেশি নয়। পরনে তার গরিবের কাপড়, কিন্তু তাকে শ্রমিক বলে মনে হয় না। তার পাশে রক্তের ভিতরে পড়েছিল একখানা চাকু ছুরি—সেখানা তার নিজের না হত্যাকারীর তা জানবার উপায় নেই। তার জামার পকেটের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে সস্তায় তোলা একখানা ফোটোগ্রাফ। এই দ্যাখো।

কর্কটের মতন একটা মূর্তির ছবি, চেহারা দেখলে কার্তিক বলে ভ্রম হয় না। মুখ যেন বেবুনের মতো। পুরু পুরু ভুরু।

ফটোখানা ভালো করে পরীক্ষা করে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে নেতাজি মূর্তির খবর কী?

—তোমার আসবার একটু আগে সে খবর পেয়েছি। এখান থেকে খানিক তফাতে মনোমোহন রোডে একখানা খালি বাড়ির সামনেকার বাগানে খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। আমি সেখানে যাচ্ছি, তুমিও আসবে নাকি?

—নিশ্চয়! হারাধনবাবু কি তাঁর সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ দেখতে চান? হারাধনবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, সময় নেই মশাই, সময় নেই। এই হত্যাকাণ্ডের খবর এতক্ষণে। নিশ্চয়

অন্য অন্য রিপোর্টারদের হাতে গিয়ে পড়েছে, অথচ আমার বাড়িতে খুন, আর আমি কিছু লিখতে পারলুম না। হায়রে, এমনি আমার দগ্ধদৃষ্ট।

।।তিন ।। হিরালাল

যে-মহামানুষকে নিয়ে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিস্ময়কর আন্দোলনের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে সত্যিকার ভাই বলে মেনে নিয়েছিল এবং যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে বাধা দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধিকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল তারই খণ্ড-বিখণ্ড প্রতিমূর্তির স্বাভাবিক পরিণাম দেখে জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর সে ভগ্নমূর্তির এক-একটা টুকরো একে একে কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত মনো েযোগর সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগল।

তার মুখ দেখেই মানিক বুঝতে পারল যে এতক্ষণ পরে জয়ন্ত একটা না একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

জয়ন্ত বললে, স্পষ্ট গন্ধ পেতে এখনও দেরি আছে কিন্তু তবু—তবু তবু—হ্যাঁ, একটু আলোর আভাস পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে যেন। অদ্ভুত অপরাধটি এই মামলার সঙ্গে জড়িত, তার কাছে এই যৎসামান্য পুতুলের মূল্য যে-কোনও মানুষের প্রাণের চেয়েও বেশি! অথচ পুতুলটা হস্তগত করেই সে ভেঙে ফেলে!

—পাগলের পাগলামি আর কাকে বলে?

-না, তা নয় সুন্দরবাবু। একটা মস্ত কথা ভেবে দেখুন। মূর্তিটা সে হারাধনবাবুর বাড়ির ভিতরেও ভাঙেনি, বাইরেও ভাঙেনি, ভেঙেছে এত দূরে এসে—অথচ তার উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিটা হাতে পেলে ভেঙে ফেলা।

—যে লোকটা খুন হয়েছে, সে হঠাৎ এসে পড়াতেই হয়তো মূর্তিটাকে ঘটনাস্থলে ভেঙে ফেলা সম্ভবপর হয়নি।

—হতে পারে। কিন্তু বাগানের ভিতরে এই বাড়ির অবস্থানের দিকে আপনি ভালো করে লক্ষ করেছেন কি?

সুন্দরবাবু চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আরে লক্ষ করে আবার করব কী? এটা হল খালি বাড়ি, আসামি তাই বুঝেছিল যে, কেউ তার কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারবে না।

—আপনি হয়তো দেখেননি, কিন্তু আমি দেখেছি যে হারাধনবাবুর বাড়ি থেকে এখানে আসবার আগেই পাওয়া যায় আর একখানা খালি বাড়ি! আসামি সেখানেই মূর্তিটা ভাঙেনি কেন? সে কেবল মূর্তি চুরি করেনি, একটা নরহত্যাও করেছে, যত দূর মূর্তিটা বহন করে নিয়ে আসবে তার পক্ষে ততই বেশি বিপদের সম্ভাবনা। তবু কেন সে গ্রহণ করেনি মূর্তি ভাঙবার প্রথম সুযোগ?

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই।

মাথার উপরকার আলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, আগেকার খালি বাড়িতে আলো ছিল না, কিন্তু এখানে আলো আছে। আসামি অন্ধের মতো মূর্তি ভাঙতে রাজি নয়, মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলো ভালো করে স্বচক্ষে দেখতে চায়।

—এথেকে কী বুঝব?

—আপাতত কিছুই বোঝবার দরকার নেই। পরে হয়তো এটা একটা বড়ো সূত্র বলে গণ্য হবে। যাক। এখন আপনি কী করতে চান সুন্দরবাবু?

—আমি। আমি আগে দেখব মৃতদেহটা কেউ শনাক্ত করতে পারে কি না। সে কে আর তার বন্ধুবান্ধবই বা কারা, এটা জানতে পারলে মামলাটার কিনারা করা কিছুই কঠিন হবে না। তাই নয় কি?

—খুব সম্ভব তাই। আমি কিন্তু অন্যভাবে মামলাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাই।

-কী রকম?

—আপাতত আমার মত আপনার ঘাড়ে চাপাতে আমি রাজি নই। আমরা স্বাধীন ভাবে কাজ করি আসুন। খানিকটা অগ্রসর হবার পর আবার দুজনে মিলে পরামর্শ করা যাবে, কী বলেন?

—বহুৎ আচ্ছা।

মৃতের পকেট থেকে যে-ফটোখানা পাওয়া গেছে সেখানা আমায় দিতে পারেন?

—এই নাও, কিন্তু ছবিখানা কালকেই ফিরিয়ে দিয়ে।

—উত্তম! এখন বিদায় হলুম! খানিক দূরে এসে জয়ন্ত ডাকলে, মানিক।

-উঃ।

-হারাধনবাবু নেতাজির মূর্তিটি কিনেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে। চলো, সেখানে যাই।

শ্যামবাজারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে গিয়ে শোনা গেল, দোকানের মালিক অনুপস্থিত। বৈকালের আগে ফিরবেন না।

জয়ন্ত বললে, আপাতত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আমাদের ঠাঁই হল না। অতঃপর হাঁড়ির অন্য ভাত টিপে দেখতে হবে। চলো মানিক চিৎপুর রোডের শিল্পশালায়।

শিল্পশালার মালিক অনিলবাবু জয়ন্তের প্রশ্ন শুনে বললেন, হ্যাঁ মশাই। ওই কাউন্টারের উপরেই ছিল নেতাজির মূর্তিটা। যদি কোনও বদমাইশ যখন খুশি যেখানে-সেখানে ঢুকে যা ইচ্ছে তাই করে লম্বা দিতে পারে, তাহলে মিথ্যে আমরা টেক্সো দিয়ে মরি কেন?

—ডাক্তার চারু চক্রবর্তীও তো আপনার কাছ থেকে নেতাজির আর-দুটো মূর্তি কিনেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কিন্তু সেখানেও তো শুনছি এই কাণ্ড হয়েছে। এ সব আর কিছু নয়, কমিউনিস্টদের কীর্তি।

—আপনার এখানে নেতাজির আর কোনও মূর্তি আছে?

–না মশাই আর নাই।

—ওই মূর্তি তিনটি আপনি কোথা থেকে কিনেছিলেন?

–বড়োবাজারে আগরওয়ালা অ্যান্ড সন্স থেকে। ওঁদের অনেক দিনের মস্তকড়ো কারবার।

–এই ফটোখানা কার বলতে পারেন?

—উহুঁ। না, না, চিনেছি? হিরালাল!

—হিরালাল কে?

—পাথরের কারিগর। অল্পস্বল্প মূর্তি গড়তে আর ছবির ফ্রেম গিলটি করতে পারে। গেল হপ্তাতেও সে এখানে কাজ করে গেছে। তার ঠিকানা আমি জানি না। সে চলে যাবার ঠিক দুদিন পরেই আমার দোকানের নেতাজির মূর্তিটা ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যায়।

শিল্পশালার বাইরে এসে মানিক বললে, তুমি কোন তালে আছ কিছুই বুঝছি না জয়ন্ত। এইবারে কোন দিকে যাত্রা?

–বড়োবাজারে। আগরওয়ালা অ্যান্ড সন্স কারখানায়।

বড়বাজারে–অন্ধকার ও দুর্গন্ধের মুলুক। সংকীর্ণ অলিগলির অত্যান্ত জনস্রোত ভেদ করে জয়ন্ত ও মানিক যথাস্থানে এসে হাজির হল। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে একটা দ্বারপথ দিয়ে তারা দেখতে পেলে, উঠানে বসে কারিগরদের কেউ পাথর কাটছে, কেউ ছাঁচ থেকে মূর্তি গড়ছে।

ম্যানেজার মাড়োয়ারি। জয়ন্তের জিজ্ঞাসার জবাবে পুরাতন খাতা খুলে দেখে বললেন, আমরা নেতাজির অনেক মূর্তি গড়েছি। বছরখানেক আগে একই ছাঁচ থেকে নেতাজির যে মূর্তি গড়া হয় তার মধ্যে তিনটে গিয়েছে শিল্পশালায় আর বাকি তিনটি পাঠানো হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। পরে ওই ছাঁচ থেকে আরও অনেক মূর্তি গড়া হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি পাঠানো হয়েছে কলকাতার বাইরে।

—মূর্তিগুলি কেমন করে তৈরি করা হয়।

–মুখের দুই ধার থেকে নেওয়া দুটো ছাঁচ। তারপর ছাঁচ দুটো একসঙ্গে যুক্ত করে মূর্তি গড়া হয়। ভিতরটা থাকে ফাঁপা। ভিজে প্লাস্টার শুকিয়ে গেলে গুদামজাত করা হয় মূর্তিগুলো।

জয়ন্ত ফটোখানা বার করে বললে, একে চেনেন কি?

ম্যানেজারের মুখে-চোখে ফুটে উঠল ক্রোধের চিহ্ন। উত্তপ্ত ভাবে তিনি বললেন, সেই বদমাইশ হিরালাল। ওকে আবার চিনি না, খুব চিনি! ওরই জন্যে আমাদের কারখানায় হাঙ্গামা হয়।

-তাই নাকি?

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। হিরালাল জয়পুরের লোক। সে আর এক জয়পুরিয়াকে ছোরা মেরে এসে ভালোমানুষের মতো কারখানায় বসে কাজ করছিল, তারপর পুলিশ আমাদের

কারখানায় ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আর আমাদেরও ছুটোছুটি করে মরতে হয় থানায় আর আদালতে। ওরকম বাঁদরমুখো মানুষকে কাজ দিয়ে আমরাই অন্যায় করেছিলুম। কিন্তু মশাই, সে খুব পাকা কারিগর।

–বিচারে তার শাস্তি হয়?

হ্যাঁ। যাকে ছোরা মেরেছিল সে মরেনি বলে হিরালাল সে যাত্রা বেঁচে যায়। মাত্র এক বছর জেল খেটে এখন সে বোধ হয় মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সে আর এমুখো হবার ভরসা করবে না। তার এক সম্পর্কীয় ভাই এখানে কাজ করে, তারও সঙ্গে কথা কইবেন নাকি?

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, না না, তাকে ডাকবার দরকার নেই। অনুগ্রহ করে তাকে আমাদের কোনও কথাই জানাবেন না।

–ব্যাপারটা কি গোপনীয়?

–হ্যাঁ, অত্যন্ত। তারপর আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। পাকা খাতা দেখে আপনি তো বললেন যে নেতাজির ওই ছয়টি মূর্তি গেল বছরের ৩রা জুন তারিখে এখান থেকে বাইরে গিয়েছে। আচ্ছা, হিরালাল গ্রেপ্তার হয় কোন তারিখে বলতে পারেন?

–ঠিক তারিখ মনে নেই। তবে সে কোন তারিখে শেষ মাইনে নিয়েছে খাতা দেখে তা বলতে পারি।

–বেশ, তাহলেই আমার চলবে।

খাতার পাতা উলটে ম্যানেজার বললেন, হিরালাল শেষ মাইনে নিয়েছে গেল বছরের ১০ই মে তারিখে। সে প্রায় ওই সময়েই গ্রেপ্তার হয়।

–ধন্যবাদ। আর আপনাকে জ্বালাতন করব না। এসো মানিক।

বৈকালবেলায় জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব হল শ্যামবাজারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। মস্ত বড় দোকান—অনেকগুলো বিভাগ। তারা একেবারে ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

তাদের পরিচয় পেয়ে ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ মশাই, হারাধনবাবুর বাড়ির খবর আমরা পেয়েছি। তিনি আমাদের পুরানো খরিদ্দার। নেতাজির মূর্তিটি আমাদের এখান থেকেই কিনেছিলেন বটে।

জয়ন্ত শুধোলে, আপনাদের এখানে আরও দুটি নেতাজির মূর্তি আছে?

-না মশাই নেই। বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যারা কিনেছেন তারাও আমাদের চেনা খরিদ্দার। খাতায় তাদের নাম আর ঠিকানা আছে।

-তাই আমি চাই।

-খাতা দেখে ম্যানেজার বললেন, একজনের নাম প্রফেসার সুরেশচন্দ্র বসু, ঠিকানা-চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন, কলকাতা। আর-একজন শ্যামাপ্রসাদ সেন। ঠিকানা-সাত নম্বর চন্দ্রকান্ত রোড, শ্রীরামপুর।

—আপনাদের কর্মচারীরা ইচ্ছা করলেই এ খাতার উপরে চোখ বুলোতে পারে তো?

—তা পারবে না কেন! এ খাতা তত গোপনীয় নয়।

-ফটোর এই লোকটাকে কখনও দেখেছেন?

—জীবনে নয়! অমন বাঁদুরে চেহারা একবার দেখলে ভোলা অসম্ভব!

—হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। আপনার এখানে জয়পুরের কোনও লোক কাজ করে?

-করে বইকি! একজন নয়, তিনজন।

—আচ্ছা মশাই, নমস্কার।

।। চার ।। খুশি মুখ আরও খুশি

সান্ধ্য চায়ের বৈঠক।

মানিক বললে, তোমার মুখ যে আজ ভারী খুশি খুশি দেখাচ্ছে জয়ন্ত।

–বুঝতে পেরেছ?

–তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পারব না? তোমার মুখ যে আমার কাছে দশবার-পড়া কেতাবের মতো পুরানো।

–উপমায় তুমি দেখছি কালিদাস।

–খুশি হবার কারণটা কী বলো দেখি?

–সবুর করো, সবুরে মেওয়া ফলে। আমি এখন সুন্দরবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। না না আর অপেক্ষা করতে হবে না। সিঁড়ির উপরে যে ওই তাঁর পায়ের শব্দ।

মানিক চেঁচিয়ে বললে, ইংরেজিতে প্রবাদ আছে যে স্মরণ করলেই শয়তান দেখা যায়। তুমি সুন্দরবাবুকে স্মরণ করেছ, সুতরাং–

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে সুন্দরবাবু বললেন, তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি মানিক। আমাকে কার সঙ্গে তুলনা করছ?

–তুলনা নয়, আমি একটা প্রবাদের কথা বলছিলুম।

–চুলোয় যাক তোমার প্রবাদ। ওসব ছেড়া কথায় কান দেবার সময় আমার নেই। তাঁ হে জয়ন্ত, তোমার খবর কী?

–ভালো। নেতাজির মূর্তি নিয়ে আজ যথেষ্ট গবেষণা করা গিয়েছে।

–নেতাজির মূর্তির পিছনে এখনও তুমি লেগে আছ? বেশ, বেশ–যার যা পদ্ধতি, আমি আপত্তি করব না। আমি কিন্তু এবারে তোমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি।

–আঁ, তাই নাকি?

–যে লোকটা খুন হয়েছে তাকে শনাক্ত করতে পেরেছি।

–বলেন কী!

–খুনের কারণও আবিষ্কার করে ফেলেছি!

–সাধু সাধু!

–অবনীবাবুকে জানো তো? ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের, যত মেড়য়াবাদীর নাম-ধামচেহারা তাঁর নখদর্পণে। লাশটা দেখেই তিনি চিনে ফেলেছেন। যার লাশ তার নাম হচ্ছে রাধাকিষণ, দেশ জয়পুরে। লোকটা নাকি পয়লা নম্বরের গুন্ডা, একটা মস্ত দলের সর্দার। অথচ সে হচ্ছে ভদ্র বংশের ছেলে। দেশে সুমিত্রা নামে তার এক ভগ্নী আছে, সে-ও একবার একটা চুরির মামলায় জড়িয়ে পড়ে কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তাহলেই ব্যাপারখানা কতটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, বুঝেই দ্যাখো। আমার কী আন্দাজ জানো? যে তাকে খুন করেছে সেও তার দলের লোক। যে-কোনও কারণে রাধাকিষণ তাকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। ঘটনার রাতে হঠাৎ তাকে হারাধনবাবুর বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে তার অপেক্ষায় পথের উপরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সে বেরিয়ে এলে তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে রাধাকিষণ নিজেই পটল তুলতে বাধ্য হয়। কী বলো জয়ন্ত, আমার আন্দাজ কি ভুল?

জয়ন্ত হাততালি দিয়ে বলে উঠল, খাসা সুন্দরবাবু! কিন্তু এককোটা চোনা রয়ে গেল নাকি?

–কেন?

–খুনি নেতাজির মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে কেন?

–আরে রেখে দাও নেতাজির মূর্তি। ও কথা কি কিছুতেই ভুলতে পারবে না। তুচ্ছ পুতুল চুরি, বড়োজোর ছয় মাস জেল। কিন্তু আসলে এটা খুনের মামলা আর সেইটাই হচ্ছে কর্তব্য।

–এরপর আপনার কী কর্তব্য হবে?

–খুব সোজা। অবনীবাবুকে নিয়ে যাব বড়োবাজারের বস্তিতে, খুব সম্ভব ফটোর লোকটাকে তাহলে আজকেই গ্রেপ্তার করতে পারব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে?

–উঁহু। আমার বিশ্বাস আরও সহজে আসামির দেখা পেতে পারি। অবশ্য আমি জোর করে কিছুই বলতে চাই না। আপনি যদি আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে আসেন, আর দৈব যদি সহায় হয়, তাহলে হত্যাকারী নিজেই আপনার হাতের মুঠোর ভিতরে এসে পড়বে।

–কোথায় যেতে হবে শুনি? বড়োবাজারে?

–না, চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেনে। আমি অঙ্গীকার করছি সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজ ভুল হলে কাল আমি আপনার সঙ্গে বড়বাজারের বস্তিতে ভ্রমণ করতে যাব। কী বলেন, রাজি?

–হুম।

মানিক সকৌতুকে বলল, হুম? এখানে হুম মানে কী দাদা? হুঁ!

–তাই ধরে নাও।

জয়ন্ত টেবিলের সামনে গিয়ে একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি কী লিখে সেখানা খামের ভিতর পুরলে। তারপর খামের উপরে ঠিকানা লিখতে লিখতে চেঁচিয়ে ডাকল, মধু! ওরে অ-মধু! শ্রীমধুসূদন! পুরাতন ভৃত্য মধু এসে হাজির।-আজ্ঞে বাবু।

—যাও তো বাপু, এই চিঠিখানা নিয়ে। তুমি তো পড়তে জাননা। খামের উপরে ঠিকানা লেখা আছে, পারো তো দৌড়ে যাও-বড্ড জরুরি চিঠি!

মধুর প্রস্থান। জয়ন্তের গাত্রোত্থান। সে বললে, সুদরবাবু তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিন। রাত সাড়ে দশটার সময়ে আবার এখানে পদার্পণ করলেই চলবে। আমরা সাড়ে এগারোটার ভিতরে যাত্রা করব।

সুন্দরবাবু প্রস্থান। জয়ন্ত বললে, মানিক, আমাকে এখন পাশের ঘরে গিয়ে পুরানো খবরের কাগজের ফাইল ঘাঁটতে হবে। আজ রাত্রে বোধ হয় অনিদ্রারই ব্যবস্থা। তুমি ইচ্ছা করলে অল্পবিস্তর বিশ্রাম করতে পারো।

রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত বেরিয়ে এল ধূলি ধূসরিত হস্তে।

সোফার উপরে লম্বা হয়ে শুয়েছিল মানিক। বললে, কী বন্ধু তোমার খুশি মুখ যে আরও খুশি হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে!

দুই ভুরু নাচিয়ে জয়ন্ত বললে, আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি।

।। পাঁচ ।। হিরালালও কুপোকাত

রাত সাড়ে এগারোটা। সদর দরজায় অপেক্ষা করছিল জয়ন্তর মোটর। সুন্দরবাবুও মানিকের সঙ্গে সে মোটরে গিয়ে উঠল।

–সুন্দরবাবু যে সশস্ত্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। মানিক, তুমিও রিভলভার এনেছ তো? জয়ন্ত বললে।

–সে কথা আবার বলতে? মানিকের উত্তর।

গাড়ি ছুটল। এ-রাস্তা ও-রাস্তা মাড়িয়ে গাড়ি যখন একটা চৌমাথায় হাজির হল, কলকাতা শহর তখন যেন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

জয়ন্ত চালককে ডেকে বললে, গুট্টা সিং, গাড়ি থামাও। এখানেই তুমি আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। আমাদের এখন শ্রীচরণই ভরসা। নাম মানিক, নামুন সুন্দরবাবু! আরে মশাই আপনার নাসাযন্ত্র যে সংগীত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। বলি ঘুমোলেন নাকি?

সুন্দরবাবু ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে প্রকাণ্ড একটি হাই তুলে বললেন, ঘুমোইনি হে, ঘুমোইনি। এই বিষম গরমে শীতল সমীরণ সেবন করে কিঞ্চিৎ তন্দ্রাতুর হয়েছিলুম আর কী? আমি এখন সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত। কী বলবে বলো–হুম।

–এইবার গাড়ি থেকে অবতরণ করবার সময় এসেছে।

–এসেছে নাকি? এই আমি নেমে পড়লুম।

–গাড়ি নিয়ে বেশি দূর যাওয়া সঙ্গত নয়। এইবার পদব্রজে মিনিট পাঁচেক অগ্রসর হতে হবে।

হুম–যো হুকুম। আমি প্রাচীন সৈনিক, যা বললা তাতেই রাজি। এই আমি সবেগে পদচালনা করলুম।

পথে আর লোক চলাচল নেই বললেই চলে। গোটা কয়েক কুকুর শহরের মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছে এবং রাস্তার এখানে ওখানে দুই-তিন বা ততোধিক ষাঁড় গা এলিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে নির্বিকার ভাবে করছে রোমন্থন।

চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন। রেলিং ঘেরা জমির ভিতর একখানা মাঝারি আকারের বাড়ি তার গায়ে কোথাও নেই আলোর রেখা। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করছে। রাস্তার ইলেকট্রিক পোস্টের আলোয় সুন্দরবাবু নামটা পাঠ করলেন– প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু।

জয়ন্ত বললে, রাত্রেও এ বাড়ির ফটক বন্ধ হয় না দেখছি। চলুন সুন্দরবাবু, বাগানে ওই হামুহানার ঝোপের আড়ালে গিয়ে আমরা লুকিয়ে থাকি। নয়তো অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের মশকদংশন সহ্য করতে হবে। হয়তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে প্রকাণ্ড একটি অশ্বডিম্ব! উপায় কী, যে পূজার যে মন্ত্র।

কিন্তু জয়ন্তের আশঙ্কা সফল হল না। আধ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কোথা থেকে আচমকা দেখা দিল একটা ছোট্ট কালো মূর্তি, তিরের মতন বাগানের ভিতর ছুটে এসেই সে বাড়ির ছায়ার ভিতরে কোথায় হারিয়ে গেল। ঠিক যেন একটা বানর। কয়েক মূহুর্ত কেটে গেল নীরবে। তারপর একটা শব্দ কে যেন একটা জানালা খুলছে ধীরে ধীরে। তারপর আবার সব চুপচাপ।

জয়ন্ত বললে, এসো মানিক, আমরা জানলার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চোর বাইরে বেরুলেই গ্রেপ্তার করব।

কিন্তু তারা দুই-এক পা এগুবার আগেই বাড়ির ভিতর থেকে আবার হল সেই মূর্তিটার আবির্ভাব। তার হাতের তলায় রয়েছে সাদা মতন কী একটা জিনিস। সে চারদিকটা একবার চটপট দেখে নিলে। এখনকার নীরবতার ও নির্জনতায় বোধ হয় আশ্বস্ত হল। হাতের জিনিসটা মাটির উপরে নামিয়ে রাখলে। তারপর জেগে উঠল ফটাফট শব্দ।

জয়ন্ত সঙ্গীদের নিয়ে বেগে ছুটে এল তার দিকে। লোকটা তখন হেঁট হয়ে এমন একাগ্র মনে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে যে কিছু বুঝতে পারলে না। তার পিঠের উপরে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত। এবং সে কোনও বাধা দেবার আগেই মানিকের সাহায্যে

সুন্দরবাবু হাতকড়া দিয়ে তার দুই হাত করলেন বন্দী। তাকে চিত করে ফেলতেই দেখা গেল তার হাড়কুৎসিত বেলুনের মুখখানা অবিকল সেই ফটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবি।

জয়ন্ত মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—সেখানে ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে আছে নেতাজির আর একটি মূর্তির ভাঙা টুকরো। সে একে একে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় বাড়ির ভিতরে জ্বলে উঠলো আলো এবং দরজা খুলে বেরিয়ে বাগানের উপর এসে দাঁড়াল আর এক মূর্তি।

জয়ন্ত মুখ তুলে শুধোলে, আপনিই বোধ হয় প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ আর আপনি নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু? আপনার পত্র আমি যথাসময়েই পেয়েছি আর কাজ করেছি, আপনার উপদেশ মতোই। যাক বদমাইশটা ধরা পড়েছে দেখে খুশি হলুম। আসুন, একটু চা-টা খেয়ে যান।

সুন্দরবাবু বললেন, এই কি চা খাবার সময় মশাই? এই পরমসুন্দর মানুষটিকে লকআপে পুরতে না পারলে আমি ঘুমোবারও সময় পাব না। দেখি সোনার চাদ, তোমার পকেটে কী সম্পত্তি আছে।

বন্দি কোনও কথা কইলে না। কিন্তু সুন্দরবাবু তার দিকে হাত বাড়াতেই সে দাঁত-মুখ খিচিয়ে খাঁক করে তাঁর হাতে কামড়ে দিতে এল।

সুন্দরবাবু চট করে নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, ওরে বাবা হয়েছিল আর কী? তুই বেটা মানুষের ছদ্মবেশে বুনো জন্তু নাকি? হুম, এর মুণ্ডুটা দুই হাতে আচ্ছা করে চেপে ধরো তো মানিক! সাবধান যেন কামড়ে না দেয়? এর পকেটগুলো হাতড়ে না দেখলে চলবে না।

আসামির পকেট হাতড়ে পাওয়া কেবল তিন টাকা দশ পয়সা আর একখানা ছোরা।

জয়ন্ত ছোরাখানা আলত পরীক্ষা করে বললে, হু এর হাতলে এখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে দেখছি। নিশ্চয়ই গুণ্ডা রাধাকিষণের রক্ত।

সুন্দরবাবু বললেন, ওহে রূপবান পুরুষ, কোন নাম ধরে তোমাকে সম্বোধন করব বাপু?

বন্দি নিরুত্তর।

–নাম বললে না? জীতা রহো বেটা! কিন্তু তুমি তো জানো না ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অবনীবাবুর কাছে গেছে তোমার নাম-ধাম আর যাবতীয় গুণাবলী কিছুই আর ধামাচাপা থাকবে না।

জয়ন্ত বললে, রাত বাড়ছে সুন্দরবাবু।

–হ্যাঁ , আমরাও এইবার গা তুলব। কিন্তু ভাই জয়, তুমি যে কেমন করে জানতে পারলে এই খুনেটা আজ আসবে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

—আপাতত বুঝে কাজ নেই, কারণ আমার কাছেও এখনও সব রহস্য পরিষ্কার হয়নি। এ লোকটা নেতাজির মূর্তি ভাঙে কেন?

—আরে থো করো ও কথা! এটা হচ্ছে খুনের মামলা, খুনি গ্রেপ্তার হয়েছে, এখনও তুমি নেতাজির মূর্তি নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করছ কেন?

–না, সুন্দরবাবু, এটা খুনের মামলা নয়, এটা হচ্ছে নেতাজির মূর্তির মামলা। আমার ধারণা খুনোখুনির কারণই হচ্ছে নেতাজির মূর্তি, সে কারণ আবিষ্কার করতে না পারলে আদালতে আপনার খুনের মামলা ফেঁসে যাবে।

—অত বাক্যব্যয় কেন, কারণটা ব্যক্তই করো না বাপু!

কারণ অনুমান করেছি বটে, কিন্তু সে অনুমান সত্য বলে প্রমাণ করবার উপায় আমার হাতে নেই। তবে আসছে পরশুদিন বৈকালে আপনি যদি আমার বাড়িতে শুভাগমন করেন, তাহলে মেঘ সরিয়ে আপনাকে সূর্যালোক দেখাবার আশা করলেও করতে পারি।

।। ছয় ।। মমতাজ বেগমের কালো মুক্তা

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সুন্দরবাবু দেখা দিলেন জয়ন্তের বৈঠকখানায়।

জয়ন্ত বললে, খবর শুভ তো?

সুন্দরবাবু গর্বিত ভাবে বললেন, তোমার আগেই আমি সূর্যালোক দেখতে পেরেছি। জয়ন্ত।

—আপনি ভাগ্যবান।

-না, ঠাট্টা নয়। অবনীবাবু খোঁজখবর নিয়ে এর মধ্যেই আসামির সব গুপ্তকথা জানতে পেরেছেন। তার নাম হিরালাল, বাড়ি জয়পুরে। আগে তার স্বভাব ভালোই ছিল, সৎপথে থেকে মূর্তি গড়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। তারপর কুসংসর্গে মিশে সে গোল্লায় যায়। দু-বার জেল খাটে একবার চুরি করে, আর একবার ছোরা মেরে। নেতাজির মূর্তিগুলো কেন যে ভাঙল এখনও তা জানা যায়নি; কারণ হিরালাল ও সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে নারাজ। কিন্তু আমরা সন্ধান নিয়ে এইটুকু জানতে পেরেছি যে, মূর্তিগুলো তার নিজের হাতেই গড়া; সুন্দরবাবু নিজের মনের কথা বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্ত বোধ হয় মন দিয়ে তার কথা শুনছিল না, থেকে থেকে সে যেন কান পেতে কী শোনে, মাঝে মাঝে উঠে জানলার ধারে যায় তারপর আবার আনে এসে বসে পড়ে।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, তোমার আজ কী হয়েছে জয়ন্ত? তুমি এমন অন্যমনস্ক কেন?

–বোধ হয় আমার হিসেবে ভুল হয়েছে। এখন আপনার কাছে কেমন করে মুখ রক্ষা করব জানি না।

—এ আবার কী কথা?

—আজ এখানে আসবার জন্যে গেল কাল একজনকে টেলিগ্রাম করেছিলুম। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উতরে গেল, তিনি এলেন না।

–কে তিনি?

শ্যামাপ্রসাদ সেন, থাকেন শ্রীরামপুরে। তাকে কী দরকার?

–খুনি কেন যে নেতাজির মূর্তিগুলো ভাঙত, হয়তো এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে তার কাছেই।

–প্রশ্নের উৎপত্তি কলকাতায়, আর উত্তর আসবে শ্রীরামপুরে থেকে, অবাক!

জয়ন্ত সচমকে বললে, মানিক দরজার একখানা গাড়ি এসে থামল না? একবার দেখে এসো তো।

মানিক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল একটি প্রাচীন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। তার ডান হাতে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া একটা জিনিস।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই কি শ্রীরামপুরের শ্যামাপ্রসাদবাবু?

–আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে পারিনি বলে মাপ করবেন। আজকাল ট্রেনের ধরন-ধারণ জানেন তো?

-বসুন। নেতাজির মূর্তিটি এনেছেন তো?

–হ্যাঁ, এই যে আমার হাতে।

–উত্তম। তাহলে কাজের কথা হোক।

–জয়ন্তবাবু, আপনি কি সত্য-সত্যই মূর্তিটি তিনশো টাকা দিয়ে কিনতে চান?

–নিশ্চয়ই।

-কেমন করে জানলেন ওই মূর্তিটি আমার কাছে আছে?

–লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ম্যানেজার আমাকে বলেছেন।

-তাহলে একথাও শুনেছেন তো মূর্তিটি আমি কিনেছি কত টাকা দিয়ে?

–না।

–মশাই, আমি মস্ত ধনী নয় বটে, কিন্তু ঠক-জুয়াচোরও নই। আগে থাকতেই আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই, মূর্তিটির দাম দশ টাকা মাত্র।

-শ্যামাপ্রসাদবাবু, আপনার সততা দেখে খুশিও হচ্ছি, বিস্ময়ে হতবাকও হচ্ছি। মূর্তিটির আসল দাম যাই হোক, আমি তিনশো টাকা দিয়েই ওটি আপনার কাছ থেকে কিনতে চাই।

শ্যামাপ্রসাদ কাগজের মোড়ক খুলে মূর্তিটি টেবিলের উপরে রাখলেন।

পকেট থেকে তিনখানা একশো টাকার নোট বার করে জয়ন্ত বললে, শ্যামাপ্রসাদবাবু, টেবিলের উপরে কাগজ কলম আছে। এই দুইজন সাক্ষীর সামনে আপনি অনুগ্রহ করে লিখে দিন যে তিনশো টাকার বিনিময়ে মূর্তিটি আমার কাছে বিক্রয় করলেন, ওর উপরে ভবিষ্যতে আপনার কোনও দাবিদাওয়াই রহিল না।

জয়ন্তর কথামতো কাজ করে তিন শত টাকা নিয়ে প্রস্থান করলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, হুম, জয়ন্তর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, জেনে-শুনেও ঠকলে, আরে ছ্যাঃ।

জয়ন্ত মুখ টিপে, একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। একখানা নূতন টেবিলক্লথ বিছিয়ে নেতাজির মূর্তিটা তার মাঝখানে স্থাপন করে বললে, সুন্দরবাবু এইবার আমি একটি অপকর্ম করব–মহা অপকর্ম।

–দশ টাকার মাল তিনশো টাকায় কিনেই তো অপকর্ম করেছ। তারও উপরে আবার কী অপকর্ম আছে?

একটা হাতুড়ি নিয়ে জয়ন্ত বললে, আজ আমিও বরেণ্য নেতাজির ওই প্রতিমূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করব।

—তুমি যে হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছ, সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। মানিক, তোমার বন্ধুটিকে সামলাও, সে যেন আমার মাথায় হাতুড়ির এক ঘা না দেয়।

জয়ন্ত মূর্তির উপরে হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করলে এবং মূর্তিটি সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

জয়ন্ত সাগ্রহে টেবিলের উপরে হেঁট হয়ে পড়ল এবং একটা ভাঙা টুকরো তুলে সানন্দে। বলে উঠল, দেখুন সুন্দরবাবু! দ্যাখো মানিক! আমার হাতে রয়েছে মমতাজ বেগমের বিখ্যাত কালো মুক্তা!

।।সাত ।। এক ঢিলে দুই পাখি...

জয়ন্ত বলতে লাগল–মমতাজ বেগমকে সম্রাট সাজাহান যে মহামূল্যবান কালো মুক্ত উপহার দিয়েছিলেন, তার খ্যাতি পৃথিবীর দেশে দেশে।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় এই মুক্তটি কোথায় হারিয়ে যায় কেউ তা জানে না। অনেক কাল পরে মুক্তাটি কেমন করে মধ্য ভারতের প্রতাপপুরের মহারাজার হস্তগত হয়। তারপর সেদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমে মুক্তার মালিক হতেন প্রতাপপুরের মহারাজারাই।

তারপর বর্তমান মহারানির শয়নগৃহ থেকে আবার মুক্তাটি হয় অদৃশ্য। তাই নিয়ে চারিদিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সুন্দরবাবুর সে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। পুলিশ সেমামলার কিনারা করতে পারেনি। মহারানির এক পরিচারিকা ছিল, সে জয়পুরের মেয়ে, নাম সুমিত্রা। তারই উপরে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুন্দরবাবু চমকে উঠলেন যে বড়ো? আপনার মুখেই তো শুনেছি, হারাধনবাবুর বাড়ির সামনে নিহত রাধাকিষণের এক ভগ্নী আছে নাম সুমিত্রা আর সে জয়পুরের মেয়ে।

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। এই দুই সুমিত্রা একই যে ব্যক্তি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই! পুরাতন খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে আমি আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি! কাকে ছোরা মেরে হিরালাল যেদিন ধরা পড়ে, প্রতাপপুরের মহারানির শয়নগৃহ থেকে কালো মুক্তাটি অদৃশ্য হয় ঠিক তারই চারদিন আগে। কল্পনায় ঘটনাগুলো পর পর এই ভাবে সাজানো যেতে পারে!

সুমিত্রা মুক্তাটি চুরি করে ভাই রাধাকিষণের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিল। হিরালাল হচ্ছে রাধাকিষণের দুষ্কর্মের সহকারী। সে হয় মুক্তাটি তার বন্ধুর কাছে থেকে চুরি করলে, কিংবা নিজে পুলিশের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য রাধাকিষণরাই তার কাছে মুক্তাটি জিম্মা রাখল। তারপর হঠাৎ একজন লোককে ছোরা মেরে হিরালাল আগরওয়ালার কারখানায় পালিয়ে এল। তারপর সে যখন বসে বসে প্লাস্টারের মূর্তি গড়ছে সেই সময় সেখানে পুলিশের আবির্ভাব। সে বুঝলে পুলিশ তার কাপড় জামা তল্লাশি করবে। তার সামনে ছিল সবে-গড়া ভিজে প্লাস্টারের মূর্তি। সে তাড়াতাড়ি একটা মূর্তির মাথায় ছাঁদা করে মুক্তাটি ভিতরে নিক্ষেপ করে ছিদ্রটি আবার বন্ধ করে দিলে—দক্ষ কারিগরের পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। তারপর সে এক বৎসর জেল খাটতে গেল। ইতিমধ্যে নেতাজির ছয়টি মূর্তি কারখানার বাইরে এখানে-ওখানে চলে গেল। তাদের কোনটির মধ্যে যে মুক্তা

আছে বাহিরে থেকে দেখে কেউ তা বলতে পারে না। মূর্তি নাড়লেও মুক্তার অস্তিত্ব জানা যাবে না, কারণ কঁচা প্লাস্টার শুকিয়ে গিয়ে মুক্তাটিকে কামড়ে ধরেছে। মূর্তি ভাঙা ছাড়া মুক্তা আবিষ্কারের আর কোনও উপায় রইল না।

তারপর হিরালালের মেয়াদ ফুরুল। কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে দস্তুরমতো মাথা খাটিয়ে ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারলে, কোন কোন মূর্তি কোন কোন ঠিকানায় গিয়েছে। তারপর আরম্ভ হল নেতাজির মূর্তির উপরে আক্রমণ। চতুর্থ মূর্তি চুরি করতে গিয়ে হারাধনবাবুর বাড়ির সামনে হিরালালের সঙ্গে দেখা হয় রাধাকিযণের। হিরালাল জেল থেকে বেরিয়েছে শুনে রাধাকিষণ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের ফল হল রাধাকিষণের পক্ষে মারাত্মক।

সুন্দরবাবু বললেন, হিরালাল যদি তার দুষ্কর্মের সহকারীই হয় তবে রাধাকিষণ, তার ফটো নিয়ে বেড়াত কেন?

–খুব সম্ভব তৃতীয় ব্যক্তির কাছে হিরালালের খোঁজ নেবার সময়ে এই ফটো তার কাজে লাগত। যাক সে কথা। আমি বেশ আন্দাজ করলুম, খুনের পরে হিরালাল আরও তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করবে; কারণ পুলিশ তাকে খুঁজছে, এখন যথাসম্ভব শীঘ্র তার কলকাতা থেকে অদৃশ্য হওয়া উচিত।

হিরালাল যে মূর্তির ভিতরে কালো মুক্তা লুকিয়ে রেখেছে তখনও পর্যন্তও সন্দেহ আমার হয়নি। কিন্তু খালি বাড়ির সামনে ঠিক আলোর নীচে হিরালাল মূর্তিটা ভেঙেছিল বলে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল যে, ফাঁপা মূর্তিগুলোর মধ্যে এমন কোনও মূল্যবান জিনিস আছে, যার লোভে চোর এইসব কাণ্ড করে।

সন্ধান নিয়ে জানলুম, ছয়টার মধ্যে শেষ দুটো মূর্তি আছে যথাক্রমে প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু আর শ্যামাপ্রসাদ সেনের কাছে। একজন থাকে শহরেই, আর একজন শ্রীরামপুরে। আন্দাজ করলুম শহরের মূর্তিটাকে চুরি না করে কলকাতার বাইরে যাওয়া হিরালালের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমার আন্দাজ ভুল হয়নি, তারপর সুরেশবাবুর বাড়িতে স্বচক্ষে

দেখলুম হিরালাল কী যেন খুঁজছে মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলোর মধ্যে। কিন্তু তখন পুরনো খবরের কাগজের ফাইল থেকে বিখ্যাত কালো মুক্তোর ইতিহাস আমি উদ্ধার করেছি আর রাধাকিষণের সঙ্গে এই মুক্তোর চুরির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন সন্দেহও আমার মনে ঠাঁই পেয়েছে। এও জেনেছি যে রাধাকিষণ আর হিরালাল পরস্পরের পরিচিত আর একই দেশের লোক। মনে খটকা লাগল হিরালাল কি ফাঁপা মূর্তির ভিতর খুঁজছে কালো মুক্তাকেই?

কিন্তু এখনও পর্যন্ত হিরালালের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। আমার মন বললে তাহলে মুক্তা আছে ওই শেষ বা ষষ্ঠ মূর্তির মধ্যেই। সুন্দরবাবু কপাল ঠুকে আপনার সামনেই তিনশো টাকা দিয়ে আমি ওই ষষ্ঠ মূর্তিটাকে কিনে ফেললুম দেখলেন তো?

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললেন, ধন্যি ভায়া ধন্যি! একটি মাত্র ইষ্টক খণ্ড দিয়ে আজ একজোড়া পক্ষী বধ করেছ! একসঙ্গে দু-দুটো মামলার কিনারা করে ফেললে হে—ওদিকে মুক্তা চুরির আর এদিকে মূর্তি চুরির মামলা। হুম, হুম।

মানিক বললে, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবন হচ্ছে বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রতিমূর্তিও বড়ো কম অ্যাডভেঞ্চারের সৃষ্টি করলে না—নেতাজির সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসাধারণতার সম্পর্ক! জয় হিন্দ।